## ভূমিকা

# শ্রীম মডেল - গৃহস্থসন্ন্যাসের

### ১

ব্রহ্মশক্তি জগদম্বার নররূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যুগাবতার। অবতারের মহাকার্যের ভিতর ধর্মসংস্থাপন অন্যতম। এই ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দুই শ্রেণীর ভক্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক শ্রেণী, ত্যাগী সন্ন্যাসী — অপর শ্রেণী, গৃহস্থ সন্ন্যাসী। প্রথম শ্রেণীর আদর্শ — বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ, অপর শ্রেণীর আদর্শ — জ্ঞানতপস্বী শ্রীম।

অন্তরঙ্গ ভক্তজনকে জগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভাবে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার দিব্য উন্মাদের অবস্থায়। তখন এই ভক্তগণের অনেকেরই জন্ম হয় নাই। জগদম্বা শ্রীমকেও অবতারলীলা প্রকাশের পূর্বেই লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে এই সাদা চোখে চৈতন্যসংকীর্তনে দর্শন করিয়াছিলেন বটতলা ও বকুলতলা ঘাটের রাস্তায় ঠিক তেমনি, যেমনি সপার্ষদ্ চৈতন্য-নিত্যানন্দ হরিনামে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন — পাঁচ শত বৎসর পূর্বে। তাহার মধ্যে শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন।

এই দর্শনের প্রায় ২০/২২ বৎসর পর দেহধারী শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপনীত হন। দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। আনাগোনায় সে পরিচয় সুগভীর হয়।

মানবশরীরে এই দর্শনের পূর্বেই জগদম্বা ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, তোমার এই ভক্তটিকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিবে লোকশিক্ষার জন্য। সংসারতপ্ত জনগণকে সে ভাগবত শুনাইবে। তাহাতে তাহারা শান্তিলাভ করিবে। আর তাহাদের মধ্যে তাহাদেরই মত শ্রীমকে থাকিতে দেখিয়া অথচ শ্রীম-র মন সংসারের ঊর্ধ্বে পরব্রহ্মে লীন — এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দেবমানবত্ব

লাভ করিবে এই জীবনেই।

শ্রীম অল্প বয়সে সংসারতাপে জর্জরিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। কাব্যরসে সিঞ্চিত করিয়া বলিতেন, ‘এ বাগানে সে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়েছিল।’ কৃতজ্ঞতার বিনম্র বচনে কখন বলিতেন, ‘কাঁচ কুড়োতে গিয়ে আমার লাভ হলো কৌস্তুভ!’ প্রথম দর্শনেই শ্রীম-র মন হরণ করিয়াছিলেন ঠাকুর। শ্রীম বলিতেছেন — ঠাকুরকে দেখিয়া, শরীর চলিতেছে বরাহনগরের পথে — আর মন বাঁধা পড়িয়াছে পিছনে — শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে — দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে — রাণী রাসমণির ভবতারিণী মন্দিরে।

বিদেশাগত পুত্রের জননী যেরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করে, ঠাকুর শ্রীমকে সেইরূপ আনন্দ ও স্নেহপীযূষপূর্ণ চিত্তে তাঁহার অভয় চরণ প্রান্তে স্থান দিয়াছিলেন। ঠাকুরকে দর্শনের সাত দিনের মধ্যে শ্রীমকে অভয় দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ‘তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে। অভাবনীয় অচিন্তনীয় স্বপ্নের অগোচর যে সমস্যা তা মায়ের কৃপায় মুহূর্তে দূর হয়ে যায়!’

ঠাকুরকে দেখিয়া অবধি শ্রীম ভাবিতেছিলেন, এই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই শান্তি সুখ ও আনন্দের পথ। আর অন্যদিকে ঠাকুর ভাবিতেছিলেন তাঁহাকে গৃহস্থ আশ্রমে রাখিয়া আদর্শ গৃহস্থ সন্ন্যাসী তৈয়ার করিবেন। এই দুইজন — গুরু শিষ্য, অবতার ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ্ — দুইটি আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ পথের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুযোগ পাইলেই শ্রীম সন্ন্যাসের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কখনও সাক্ষাৎ ভাবে, কখনও ইঙ্গিতে প্রস্তাব করিতেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই গৃহস্থ সন্ন্যাসীর জীবন আর সাধন শিক্ষা দিতেছিলেন।

একদিন আসিল যখন উভয়েই আপন আপন পরিকল্পনা ব্যক্ত করিলেন। গোপন করিয়া কতদিন আর রাখা যায়। একদিন না একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে মনের ভাব।

শ্রীম-র ত্যাগী সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়া একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যদৃষ্টিতে কঠোর ভাব ধারণ করিলেন। বলিলেন, জগদম্বা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড়ো বড়ো আচার্যের সৃষ্টি করেন। আরও বলিয়াছিলেন,

ইঞ্জিনীয়ারের অনেকগুলি জলের পাইপ থাকে। একটা পাইপ নষ্ট হয়ে গেলে, ঐ স্থলে আর একটা নূতন পাইপ সংযোজন করে। কেহ মনে না করে, আমি জগদম্বার কাজ না করলে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। এই কথা শুনিয়া শ্রীম চিরদিনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন — নিজের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুই-ই বিসর্জন দিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল হইল।

কথামৃতের পাঠক দেখিতে পাইবেন প্রথম হইতেই ঠাকুর শ্রীমকে ব্যক্তিগতভাবে গৃহস্থ-সন্ন্যাসের শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, জগদম্বা ‘ভাগবতের পণ্ডিত’কে একটা ‘পাশ’ দিয়া সংসারে রাখেন লোকশিক্ষার জন্য, জগৎবাসীকে ‘ভাগবত’ শুনাইবার জন্য। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার ‘চাপরাস’ধারী অন্যতম প্রধান সেবক।

কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিলেন, তুমি আর কোথাও যাইবে না — খালি এখানেই আসিবে।

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য দৈবীমানুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন শ্রীম-র আদর্শ — সাত আট বৎসর ধরিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের পূর্বে শ্রীম বলিতেন, হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই কেশব সেনের জন্য ব্যাকুল ছিলাম। তাঁহার দর্শন না পাইলে কাঁদিতাম। কেশব সেন অ্যালবার্ট হলের আফিসে দরজা বন্ধ করিয়া লেখাপড়া করিতেন। একদিন মন এমন ব্যাকুল হইল যে পিলারে আরোহণ করিয়া — যেমন লোক বৃক্ষে আরোহণ করে, ঠিক তেমনিভাবে গৃহের পার্টিশানের উপর দিয়া দেখিতেছিলাম, কেশববাবু বিলিতী চিঠি লিখিতেছিলেন।

কেশববাবুর সঙ্গে — ৭/৮ বৎসরের অভ্যাস শ্রীরামকৃষ্ণের এক কথায় — তুমি আর কোথাও যাইবে না — তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীম প্রথম দর্শন করেন বিকাল বেলায়। কয়েক মাসের মধ্যে দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। শ্রীকেশব দুর্গাপূজার তিন দিন — সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে নূতন ঢঙের বক্তৃতা দিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, দুর্গাকে যদি লাভ হয়, তবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ — সকলই লাভ হয় — অর্থাৎ ধন-ঐশ্বর্য, বিদ্যা-ঐশ্বর্য, শক্তি-ঐশ্বর্য ও সিদ্ধির ঐশ্বর্য লাভ

হইবে। কারণ ইঁহারা সব মায়ের পার্শ্বদেবতা।

শ্রীম দুর্গাপূজার পর যখন ঠাকুরের কাছে গেলেন — এই তিন দিনের প্রবচন সংক্ষেপে শুনিয়াই ঠাকুর সস্নেহে, কিন্তু কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন, 'তুমি আর কোথাও যাইবে না। খালি এখানে আসিবে।' এই ঘটনাটি অনুধাবন করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মন শ্রীম-র উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ৭।৮ বৎসর যাঁহাকে হৃদয়ে দেবতার আসন দিয়াছিলেন সেই কেশব সেনকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে হৃদয়ে বসাইবার চেষ্টা করিলেন এবং পরে বসাইলেনও।

সাধকগণ বুঝিবেন ইহা কিরূপ কঠিন কার্য। ইহা সম্ভব হইয়াছিল শ্রীম-র জীবনে অতি সহজভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়।

শ্রীম কি কেশববাবুকে ছাড়িয়া দিলেন? না, তাহা নয়। তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিলেন মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই হৃদয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্দিষ্ট হইল। যে মন কেশবে নিবিষ্ট ছিল, সেই মন এখন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে!

শ্রীমকে যে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী বানাইবার ইচছা শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল, ইহা নিম্নলিখিত ঘটনাই প্রমাণ করে। শ্রীম-র দ্বিতীয় দর্শন হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, অর্থাৎ প্রথম দর্শনের দুইদিন পর সকাল বেলায়। প্রথম দর্শনে বিশেষ কিছু কথা হয় নাই। দ্বিতীয় দর্শনেই শ্রীম-র অজ্ঞাতে শ্রীম-র জীবনে গৃহস্থাশ্রমের গৃহস্থ-সন্ন্যাসের বীজ বপন করিয়াছিলেন ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'গৃহে থাকতে হয় বড়লোকের ঘরের দাসীর মতন।' দাসী আপনাকে মনিবের ঘরের সঙ্গে বাহ্যদৃষ্টিতে এক করে দেয়। বলে, 'আমার রাম, আমার হরি। কিন্তু অন্তরে জানে আমার ঘর এখানে নয়, ঐ দূরে এক গ্রামে যেখানে আমার ছেলে মেয়ে আছে। তেমনি মন ঈশ্বরে সমর্পিত করে সংসারের কর্তব্য করতে হয়।'

অথবা, 'কচছপের মতন সংসারে থাকতে হয়। কচছপ থাকে জলে, কিন্তু ডিমপাড়ে আড়ায়। যেখানে ডিম সেখানে মন, শরীর জলে থাকলেও।'

বলিলেন, 'দাসী দিনরাত কাজ করে, কিন্তু তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় গৃহিণীর দেওয়া অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানে। তেমনি গৃহস্থ-সন্ন্যাসী দিবানিশি

কাজ করবে সংসারের, কিন্তু ভোগ নেবে না। যতটুকু না হলে শরীর ধারণ হয় না, ততটুকু নেবে।’

আবার বলিলেন, ‘সংসারে পাঁচজনের সঙ্গে থাকবে, তাদের বাইরের ভালবাসা দেখাবে, ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করবে — অর্থাৎ এদের অন্তরে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁর সেবা করবে। কিন্তু মনে জানবে, এরা আমার কেউ নয়, আমিও এদের কেউ নই। ঈশ্বরই এদের ও আমার আপনার। ঈশ্বরই মাতা পিতা ও বন্ধু সকলের।’

একদিন পারিবারিক কোনও বিষয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীম-র মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল — ‘আমার পুত্র’। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাবধান করিয়া সস্নেহে বলিলেন, ‘আমার পুত্র’ বলতে নেই। মনে করতে হয় ভগবানের পুত্র। আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন সেবার জন্য। কেন? যদি কিছু হয়, যদি তার শরীর ঈশ্বর নিয়ে নেন, তখন মহা বিপদে পড়বে। শোকে অধীর হয়ে পড়বে!

আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখিয়াছি, শ্রীম কখনও তাঁহার পুত্রকে ‘আমার পুত্র’ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। যে পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর শ্রীমকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পুত্র বালক অবস্থাতে এই ঘটনার কিছুকাল পরে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সে ছিল শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার শোকে পিতামাতা উভয়েই অধীর হইলেও শ্রীম সেই শোক সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু মাতা সেই শোক সারা জীবন বহন করিয়াছিলেন। কখনও শোকাগ্নিতে উন্মাদবৎ আচরণ করিতেন।

এই ঘটনাও বলিয়া দেয়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে মহর্ষি তৈয়ারী করিবেন, আচার্যরূপে জগদ্‌গুরুর পদে অভিষিক্ত করিবেন। লোককল্যাণে সারাজীবন ভগবৎসেবায় সমর্পণ করিবেন। সেইজন্য তিনি প্রথম হইতে তাঁহাকে অতি কঠোর সাধনের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীম দীর্ঘদিন ধরিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় ঠাকুরও তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী নানা কঠোর সাধনের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। একদিন শ্রীম-র কলিকাতার বাড়ি হইতে একজন একটি পত্র শ্রীম-র হাতে দিল। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সর্পদর্শন-জনিত আতঙ্কে শ্রীমকে চিৎকার করিয়া বলিলেন, ‘ফেলে দাও ফেলে

দাও।’ শ্রীম উহা ফেলিয়া দিলেন। কেন এই আচরণ? শ্রীমকে যে ঠাকুর উজানপথে লইয়া যাইতেছেন! সে পথটি সংসারের ঠিক বিপরীত। নিবৃত্তির পথ। ব্রহ্মসত্যের পথ। জগৎমিথ্যার পথ। মিথ্যা হইতে সত্যে, পরব্রহ্মে যাইবার পথ। এই পথের সন্ধান না পাইলে, এই পথে ব্রহ্মসত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কেহ জগদ্‌গুরুর আসনে আসীন হইতে পারে না। ঠাকুর তাই ঐ অদ্ভুত আচরণ করিলেন।

পুত্র ও গৃহপরিজন জগৎবাসীর কত আপনার ইহা সকলেই জানেন যারা গৃহস্থাশ্রমে থাকেন। ঠাকুর কি শ্রীমকে আপাতদৃষ্টিতে এই কঠোর নিষ্ঠুর আচরণ শিখাইলেন? না, তাহা নয়। এই শিক্ষা তিনি প্রথম দিনেই শ্রীমকে দিয়াছিলেন, ঈশ্বরই পুত্র-পরিজনের আপনার এবং তোমারও আপনার, সকলেরই চিরকালের আপনার। জগতের সম্পর্ক দুইদিনের জন্য। ঠাকুরের ঐ আচরণে শ্রীমকে তিনি ঈশ্বরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীমকে ব্রহ্মলীন তৈয়ার করিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনের ভিতরস্থিত অন্তর্যামী পরমপুরুষের উপর শ্রীম-র মন সংস্থাপিত করিলেন। তাহাদের দেহে নয়।

এই ঈশ্বরভাবে পরিজনকে দেখার দৃষ্টিটি শ্রীম-তে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমরা বহুকাল ধরিয়া তাহা দেখিয়াছি। ক্ষুদ্র বালক পৌত্রগণকেও শ্রীম শ্রদ্ধায় শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপে দেখিতেন।

আর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন — দেখ, আমার একটা কি ভাব হয়েছে। যারা হল আপনার তারা হল পর, আর যারা পর তারা হল আপনার। এই রাখাল বাবুরাম লাটু — এদের বলছি ওঠ্‌, হাত মুখ ধো, মার নাম কর। রামলাল হল পর। এরা কোথায় আছে, কি খাচেছ — তার খবর নেই।

এই কথার দ্বারাও শ্রীমকে গৃহস্থ-সন্ন্যাসের আর একটি শিক্ষা হৃদয়ে রোপণ করিতে বলিলেন — ভক্তগণই আপন জন।

ভক্তগণকে দেখিলে ভগবানের কথাই স্মরণ হয়। তাই শ্রীমকে প্রকারান্তরে বলিলেন, ভক্তগণের সঙ্গ ও সেবা করিবে সর্বদা। শ্রীম সারাজীবন এইটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা সাধু ও ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। বলা যাইতে পারে, চব্বিশ ঘন্টার

মধ্যে তেইশ ঘন্টাই তিনি ভক্তসঙ্গে থাকিতেন। অসুখের সময়ও তিনি ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। ভক্তগণই তাঁহার সেবা করিতেন।

প্রথম দর্শনের পর কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমকে সুস্পষ্ট ভাবে বলিলেন, কুটুম্বসেবা করিবে না। সাধু ভক্তের সেবা করিবে। এই কার্যটি কি প্রকার কঠিন ইহা সংসার-আশ্রমী জনগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমকে দেখিয়াছি, এই দুঃসহ পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ, শ্রীগুরুর কৃপায়। আমরা তাঁহাকে কখনও কুটুম্বসেবা করিতে দেখি নাই। কিন্তু সাধু ও ভক্তের সেবায় তিনি মুক্তহস্ত।

শ্রীম যখন তিনটি স্কুলে একসঙ্গে হেডমাস্টারের কার্য করিতেন, তখন একটি স্কুলের উপার্জন ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর বরাহনগর মঠে দিতেন। অপর একটির আয় শ্রীশ্রীমা ও ভক্তগণের সেবায় ব্যয়িত হইত। তৃতীয়টির আয় দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ হইত।

শ্রীম-র জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর অন্য পাঁচটি গুণও সম্যক্ প্রস্ফুটিত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, গৃহস্থ ভক্ত হইবে শান্ত ও নিরভিমান। কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য, আবার রসরাজ রসিক। আবার সাধু ও ভক্তের কাছে দাসানুদাস। যে কেহই শ্রীমকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীম-র জীবনে এই গুণগুলি প্রকাশিত। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণময়, যেমন হনুমান সীতারামময়। শ্রীম-র নিকট পাঁচ মিনিট বসিলে দর্শকের জগৎ ভুল হইয়া যাইত। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — এই মহাসত্য দর্শকের মন তাহার অজ্ঞাতসারে অধিকার করিয়া বসিত।

## ২

কেন শ্রীমকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রমের লোকদের শিক্ষার জন্য। এই গৃহস্থাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারত উঠিবে না। আর ভারত না উঠিলে জগৎও উঠিবে না। কেন? ভারতীয় সমাজেরও তিনটি শরীর, মানুষমাত্রেরই তিনটি শরীর — স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, ভারত তখন অপরের পদানত।

তাঁহার অন্তরঙ্গগণ এই কথা ভক্তদের সর্বদা বলিতেন, ঠাকুর আসিয়াছেন, এইবার আর কেহ ভারতকে অধীনে রাখিতে পারিবে না। ভারত স্বাধীন হইবে। তাঁহার আগমনই এই জন্য। ভারত উঠিলে জগৎ উঠিবে। ভারতের কারণশরীরটি ব্রহ্মস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর নানা কারণে দুর্বল হইয়া গেল, কিন্তু কারণশরীরটি অক্ষত, অব্যাহত। ভারতের সমাজশরীর এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় অত ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরও ভারত দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ভারতের স্থূল, সূক্ষ্ম শরীর নূতন করিয়া আবার ইহার চিরন্তন ব্রহ্মভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

উপরোক্ত এইসব শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ আপন অন্তরঙ্গগণকে দিতেন। অন্তরঙ্গগণ আমাদিগকে ঐ শিক্ষার কথা বলিতেন। আরও বলিতেন, ভারতের এই সমাজশরীর সংগঠিত করিতে হইলে ভগ্নপ্রায় গৃহস্থাশ্রমকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এইজন্য শ্রীমকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম-র জীবনটি গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ। সারা জীবন একজোড়া বস্ত্র, একজোড়া পাঞ্জাবী, একজোড়া কালো বার্ণিস করা চটীজুতা, একটি চাদর — এই ছিল শ্রীম-র জীবনভোর পোশাক। কেন? না, তাঁহাকে যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ-ঘরে দাসীর মতন থাকিতে বলিয়াছিলেন, ঘরের মালিক যে ভগবান স্বয়ং!

গৃহস্থসন্ন্যাসীর কর্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিয়াছিলেন — পিতামাতার সেবা সারা জীবন করিতে হইবে। মায়ের সম্বন্ধে আরও বড় কথা বলিলেন — মাতা যদি অসতীও হয়, তথাপি সন্তান তাহার সেবা করিবে। কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবে। পুত্রকে কার্যক্ষম করিয়া দিবে, যাহাতে সে আপন জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। পুত্রের বিবাহ দেওয়া গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর নৈতিক কর্ম নহে। শ্রীম অক্ষরে অক্ষরে ঠাকুরের এই বিধান পালন করিয়াছিলেন। শ্রীম-র একটি কন্যার বিবাহ শেষ হয় রাত্রি দুইটার সময়। ইহার পর শ্রীম ছাদের ঘরে বসিয়া ভোর ছয়টা পর্যন্ত লণ্ঠনের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের ডায়েরী খুলিয়া ধ্যানমগ্ন হন। শ্রীম নিজগৃহে প্রবাসী। শ্রীম ধর্মশালার

পথিক। নিরাশ্রয় পথিকের ভাব আরোপ করিবার জন্য শ্রীম কখনও বাস্তুহারাদের সঙ্গে সিনেট হাউসের নিম্নে ফুটপাতে রাত্রিবাস করিতেন।

### ৩

নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহাই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিবে — শ্রীম আদর্শ গৃহাশ্রমী সন্ন্যাসী। শ্রীম 'মডেল' — ভারতীয় প্রাচীন ও নবীন গৃহাশ্রম-সন্ন্যাসের।

শ্রীম-র কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত। তিনি চিরকুমার। তাঁহার চরিত্রে একটি ব্যসন ছিল। তিনি horse race (ঘোড়দৌড়) দেখিতে যাইতেন, যেমন কলিকাতাবাসী বহু লোক যায়। গড়ের মাঠে ফুটবলাদি নানা ক্রীড়ায় যেমন হাজার হাজার ক্রীড়ারসিক লোক যাইয়া থাকে, তিনিও তেমনি যাইতেন।

প্রথমে খেলা দেখিতেই যাইতেন, কিন্তু ক্রমে উহা ব্যসনের রূপ ধারণ করে। খেলার অনুসঙ্গী gambling-এ (জুয়াখেলায়) তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। শ্রীম ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বারংবার বলা সত্ত্বেও পুত্র উহা গ্রাহ্য করিলেন না, যাইতেই থাকিলেন।

তখন একদিন প্রশান্তভাবে বন্ধুর ন্যায় পুত্রকে বলিলেন, তুমি এখন শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম — যদি এই গৃহাস্থাশ্রমের নিয়ম উলঙ্ঘন করাই উচিত মনে কর, তবে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। তোমার কাজে এই আশ্রমবাসীগণ কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে।

পুত্র ঘরের বাহির হইয়া গেলেন অভিমানে। শ্রীম অন্তরে কথঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেও আমরা বাহিরে কখনও দুঃখের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

পুত্র আশ্রয় লইলেন মাতুলগৃহে। সেই স্থানে প্রায় বিশ বৎসর রহিলেন। মাতুলগৃহ বিত্তশালী। মাতুলপত্নী পুত্রের মত সস্নেহে তাহাকে রক্ষা করেন। শ্রীম-র পুত্র কিন্তু পূর্ববৎ সানন্দে রেসখেলায় যাইতে লাগিলেন।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে মাতুলপত্নী শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ দর্শনে সদলবলে বাহির হইলেন। ফিরিবার পথে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। এই

সংবাদ কলিকাতায় পোঁছিলে অপুত্রক মৃত মাতুলের উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শ্রীম-র এই দ্বিতীয় পুত্র তখন আশ্রয়হীন ও অন্নবস্ত্রহীন হইয়া খুবই দুর্দশায় পতিত হইলেন।

একদিন অপরাহ্ণে অন্তেবাসী 'কথামৃত' প্রকাশের ব্যাপারে প্রেসে যাইতেছিলেন, আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থিত মর্টন স্কুলের সম্মুখের ফুটপাথ ধরিয়া। উত্তর দিকের সিটি কলেজের নিকট হইতে তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন একজন। তিনি দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। পুনরায় ডাক। এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উত্তর দিকে চাহিয়া পরিচিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তথাপি দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইবার তিনি দেখিতে পাইলেন শ্রীম-র দ্বিতীয় পুত্র চারুবাবুকে। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্তেবাসী বড়ই ব্যথিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চারুবাবু, আপনার কি কোনও কঠিন রোগ হয়েছে? আপনার চেহারা এরূপ কেন দেখাচেছ?'

তিনি ম্লান হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'না রোগ নাই, কিন্তু দুই দিন সম্পূর্ণ উপবাস। আমাকে আপনি ত্রিশটা টাকা দিন।' অন্তেবাসী একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমকে না জানাইয়া অন্তেবাসী নিজের টাকাও দিতে পারিবেন না। কিংবা তাঁহার নিকট সাধু ও ভক্তসেবার জন্য শ্রীম-র গচিছত অর্থও দেওয়া সম্ভব নহে। উভয় সংকটে পড়িলেন অন্তেবাসী।

চারুবাবু বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, বাবাকে জিজ্ঞেস করুন।' চারুবাবু মর্টন স্কুলের অদূরে দক্ষিণ দিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অন্তেবাসী মর্টন স্কুলের দ্বিতলে উঠিয়া শ্রীমকে আফিসগৃহে দেখিতে পাইলেন, হেড ক্লার্কের আসনে। আরও দুইজন লোক একটু দূরে বসিয়া আছেন। শ্রীম-র কানে কানে অন্তেবাসী সকল কথা বলিলেন। শ্রীম কানে কানেই উত্তর দিলেন, 'দিয়ে দাও'।

অন্তেবাসী চার হাত দূরে চৌকাঠের কাছে আসিলে শ্রীম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার কানে কানে বলিলেন, 'যদি একত্রিশ দিনের দিন ফিরিয়ে দেয়, তবে দাও'।

অন্তেবাসীর মনে তুমুল ঝড় উঠিল। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ

শ্রীম, তিনি মহাপুরুষ। মনে হইতে লাগিল, তাঁহার একি আচরণ! অনাহারে পুত্র মৃতপ্রায়। আর তিনি ত্রিশ টাকা ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি পাইলে তবে দিতে বলিলেন। এ কি নূতন বিপদ! কোন অপরিচিত লোকও বিপদগ্রস্ত হইয়া অর্থ চাহিলে, যে কোনও হৃদয়বান মানুষই তাহাকে ঐ অর্থ দান করে। কিন্তু মহাপুরুষ হইয়া এ কি বিপরীত আচরণ? একদিকে পিতা, অন্যদিকে পুত্র — তাঁহাদের এই কঠিন আচরণের ভিতর অন্তেবাসী বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

আজ লক্ষ্মণের অবস্থাটা অন্তেবাসী বুঝিতে পারিলেন। একদিকে রামাজ্ঞা, অন্যদিকে শিবাবতার মহর্ষি দুর্বাসা। দুর্বাসা আসিয়াছেন রামদর্শনে। প্রাসাদমধ্যে রাম বিশেষ রাজকার্যে ব্যাপৃত। লক্ষ্মণকে প্রহরী করিলেন। লক্ষ্মণ ভাবিলেন, যদি মহর্ষি দুর্বাসাকে ভিতরে যাইতে না দিই, তাহা হইলে তিনি অভিশাপ দিয়া সমগ্র কুল ধ্বংস করিবেন। অন্যপক্ষে রামের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, আমাকে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ্মণ নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দশ টাকার তিনটি নোট বাম হাতে লইয়া অতি অশান্ত চিত্তে চারুবাবুর কাছে গিয়া অন্তেবাসী তাহা তাঁহার হাতে ছুঁড়িয়া দিলেন। আর অসম্বদ্ধ বাক্যে উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, ‘এই নিন্, একত্রিশ দিনের দিন ফিরিয়ে দিতে হবে।’*

---

* অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে, শ্রীম-র এই দ্বিতীয় পুত্র চারুবাবু তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতুষ্পুত্র বালক অনিলের হাতে একটি পত্র দিয়া বলিলেন, ‘যাও, এই পত্রটি বাবার কাছে দিয়ে এসো।’ অনিল এই পত্র শ্রীম-র কাছে লইয়া গেল এবং তাঁহার হাতে দিল। পত্রে লেখা ছিল, ‘বাবা, I am on the verge of starvation. Please give me some money' (বাবা, আমি অনাহারে মৃতপ্রায়। আমায় কিছু অর্থ দিন)’। শ্রীম পত্র পড়িয়া পিঠে লিখিয়া দিলেন, 'Yes, I will give you whatever you want, but you are to stop going to the horse race (হ্যাঁ, তুমি যা চাও আমি তোমায় দেব, কিন্তু ঘোড়দৌড়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে)। অনিল তাহার কাকার হাতে পত্র দিল। কাকা পড়িলেন, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়া অর্থ গ্রহণ করিলেন না। এ ঘটনাটিও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, মহাপুরুষের হৃদয় সত্যের নিকট, ধ্রুব নীতির নিকট বজ্রসম কঠিন। কিন্তু ভক্তের নিকট, জীবনধারণের নিকট, দুঃখীজনের নিকট কুসুমের চেয়েও কোমল — ‘বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমানীব’।

চারুবাবু অর্থ লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ঠিক একত্রিশ দিনের দিন ঐ অর্থ অন্তেবাসীকে ফিরাইয়া দিলেন।*

পিতা-পুত্রের এই ঘটনায় পাঠক কি বুঝিলেন, তাহা পাঠকই ঠিক করুন। কিন্তু বহু চিন্তা ভাবনার এবং তপস্যার পর আমি বুঝিলাম — শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। গুরুর আজ্ঞায় দাসীভাবে ঘরে রহিয়াছেন। কাহাকেও কিছু দিবার অধিকার দাসীর নাই। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই কঠোর আচরণ শ্রীম করিলেন। শ্রীম নিজ গৃহে দাসী। শ্রীম গৃহাশ্রমীর আদর্শ। শ্রীম মডেল। শ্রীম Idol (বিগ্রহ)।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় 'শ্রীম-দর্শন' মহাগ্রন্থমালার পরিসমাপ্তি হইতেছে এই পঞ্চদশ ভাগে। প্রথম ভাগের ভূমিকায় 'শ্রীম-দর্শন' লেখার প্রারম্ভিক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই উপসংহার ভাগে 'শ্রীম-দর্শন' প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজনা করিবার প্রেরণা হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। উহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

যৌবনের প্রারম্ভে এক অজনা শক্তির প্রেরণায় শ্রীম-দর্শনের প্রসূতি শ্রীম-র অমৃতময়ী বাক্যাবলী দৈনন্দিন ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলাম। যৌবনের শেষাংশে ঐ ডায়েরীকে সৎসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফেলিয়া সর্বাঙ্গীন গ্রন্থ রচনা করিবার প্রেরণা পাই হিমালয়ে, গঙ্গাতীরে, ঋষিকেশে। প্রচণ্ড কষ্ট বরণ করিয়া এবং reference book (সম্বন্ধ গ্রন্থ) সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে যাতায়াত করিয়া ডায়েরী হইতে শ্রীম-দর্শনকে উদ্ধার করিতে তপস্বী ভিক্ষাজীবীর প্রায় বিশ বৎসর লাগে। তখন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। তাহার পর 'Press Copy' (পাণ্ডুলিপি) তৈয়ারীর পালা। ডায়েরী লেখা ছাড়াও সাহিত্যিক রীতিতে পুনঃরচনা এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আমাকে ন্যূনাধিক দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখিতে হইয়াছে।

ডায়েরী হইতে শ্রীম-র কথামৃতকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার সময় তিনটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম সর্বাগ্রে। প্রথম — ঠাকুর, আমি প্রাণপাত করিয়া লিখিব, কারণ তুমি প্রাণে প্রচুর প্রেরণা দিয়াছ। আর ঐ সঙ্গে অবসর বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও ইচছারও সংযোজনা করিয়াছ। দ্বিতীয় — কিন্তু, এই মহাগ্রন্থ প্রচার ও প্রকাশ করিবার ভার তোমাকেই লইতে হইবে।

তোমার আপনার লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া তাহা তুমি প্রকাশিত করিয়া লও ভক্তজনের কল্যাণের জন্য। আমার দ্বারা প্রকাশকার্য সম্ভব হইবে না। তৃতীয় — এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর কৃপা করিয়া আমার জীবনের শেষ দিকে একান্তে ও নিশ্চিন্ত মনে তোমার চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিও।

এই তৃতীয় প্রার্থনাটির পরিপূর্ণ সুযোগ প্রভুর কৃপায় এখন আসিয়াছে।

উপরোক্ত এই দ্বিতীয় প্রার্থনার বিষয়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখন করিব — প্রকাশনের বিষয়।

গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয় চতুর্থ দশকের প্রারম্ভে। প্রথম ভাগ 'শ্রীম-দর্শন' রচনার তেইশ বৎসর পর উহা প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ রচনার পর বহু ভক্ত, বহু বন্ধু এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রকাশক হইবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এই ভার লইতে কেহই সম্মত হন নাই। যাঁহাকে দেখি তাহাকেই বলি — এ যেন এক উৎকণ্ঠা-রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভূতের সঙ্গী খোঁজার অবস্থা!

একটা ভূত সঙ্গী খুজিতেছিল। যখনই কাহারও মৃত্যু হয় সে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তি পুনর্জন্ম লাভ করে। সঙ্গী আর মিলে না। কারণ অপঘাত মৃত্যু হইলেই শুধু ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। বহু কষ্টে শেষে একটি সঙ্গী জুটিল।

'শ্রীম-দর্শন' প্রকাশ করিবার যখন লোক পাইতেছি না, উৎকণ্ঠায় দিন অতিবাহিত হইতেছে, সেই সময় ঠাকুরের কৃপায় একজন প্রকাশককে পাইলাম। আমি যেরূপ সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল, সেই প্রকাশকও ঠাকুরের 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থাবলী প্রকাশনের জন্যও তদ্রূপ আগ্রহান্বিত।

ঘটনাটি এইরূপ। শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা নির্মম রোগে আক্রান্ত হইয়া অমৃতসর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। সুবিখ্যাত চিকিৎসক তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময় একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রী ঠাকুর স্বপ্নে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন বালগোপালের বেশে। ক্রীড়ারত আনন্দময় শিশু যেমন শায়িত মাতৃবক্ষে নানা কৌতুক ক্রীড়া করিয়া থাকে, প্রফুল্ল সরস ও আনন্দমণ্ডিত সেই শিশু বালগোপালও ঠিক সেইরূপ ক্রীড়ারত। এই স্বপ্নদৃশ্যে শ্রীমতী গুপ্তার হৃদয় যখন আনন্দে

উদ্বেল, ঠিক ঐ সময়েই অদৃশ্য এক দৈবী পুরুষের উজ্জ্বল দক্ষিণ হস্ত সেলাইয়ের অভিনয় করিতেছিল। তাহাতে আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী শ্রীমতীর হৃদয়ে জীবনের আশা সঞ্চারিত হইল। হৃদয়ে তিনি উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার জীবনরক্ষা হইবে। মৃত্যুর কাল করাল ছায়া দূরীভূত হইয়া আশার ঊষার স্নিগ্ধ বিমল রশ্মিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। চিকিৎসকগণ অকস্মাৎ তাঁহার এই বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীমতী গুপ্তা কিন্তু এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কেবলমাত্র নিকট আত্মীয় দুই একজনকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, এ শরীর এখন যাইবে না। হৃদয়ে তাঁহার পূর্ব জন্মের সঞ্চিত শুভ সংস্কার ভগবানের কৃপায় জাগ্রত হইল। তিনি মনে মনে প্রভুর নিকট তাঁহার সকৃতজ্ঞ সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন — অবশিষ্ট জীবন তাঁহারই সেবায় উৎসর্গিত হইবে, যিনি কৃপা করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ইহা ১৯৬০ সালের প্রারম্ভিক জানুয়ারী মাসের কথা।

শ্রীমতী গুপ্তা তাঁহার বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও শরীরের অবস্থা মৃতপ্রায়। অচলাবস্থায় সর্বক্ষণ শয্যায় শায়িত। শুধু ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় এই শরীর মন লাগাইতে পারিবেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে যাইবার সময় দৈবযোগে একজন সাধুর শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন শ্রীমতী গুপ্তা। সাধু তাঁহার কানে কানে বলিয়াছিলেন, আমি ভবিষ্যদবক্তা নই। কিন্তু আমার মন সুপ্রসন্ন। মনের ভিতর হইতে এই আশার বাণী নির্গত হইতেছে, আপনার শরীর যাইবে না, আপনাকে ঠাকুরের কাজ করিতে হইবে। হাসপাতাল হইতে বাড়িতে ফিরিয়া কখনও আশায়, কখনও নিরাশায় তিনি সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া কখনও গৃহ, পতি, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনের চিন্তাতরঙ্গ মনের উপর দিয়া সমুদ্রতরঙ্গের মত ভাসিয়া যাইতেছিল। কখনও বা স্বপ্নদৃষ্ট জীবনদাতা ঐ অলৌকিক আনন্দময় দেব-বালকের উজ্জ্বল স্মৃতি উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করিতে লাগিল। কে এই দৈবী বালক? মঙ্গলময় কোন্ অদৃশ্য পুরুষের মঙ্গলহস্ত সেলাইয়ের সেই অভিনয় করিতেছিল? এইরূপ আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে দিন কাটিতেছিল।

সেই সময় পূর্বোল্লিখিত সাধুটি গৃহে আসিলেন শ্রীমতী গুপ্তাকে একবার দেখিবার জন্য। সময়োপযোগী যে সকল ভরসার বাণী তিনি শুনাইতেছিলেন, শ্রীমতী গুপ্তা অতি-ক্ষুধার্ত শিশুর মত সেগুলি যেন গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল কথামৃত আপনি কোথায় পাইলেন? কোথায় ইহার উৎস? ইহা যে আমাকে এক উজ্জ্বলতর জগতে লইয়া যাইতেছে! নিরাশার দুঃসহ নীড় ধ্বংস করিয়া ইহা আমাকে আশায় উজ্জ্বল এক পবিত্র আলোকের রাজ্যে চালিত করিতেছে!

সাধুটি প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে বলিতেছিলেন, মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন, অথবা নিজ স্বরূপের জ্ঞানলাভ করা। মানুষ অমৃতের পুত্র — ইহা বেদের কথা। নিজের স্বরূপের সন্ধান না পাইলে বৃথা জীবনধারণ।

বেদ বলেন, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মানুষের পূর্ব পূর্ব জন্মের দুঃখদৈন্যের কথা স্মরণ হয়। আর গর্ভবাসজনিত নিদারুণ কষ্টে জর্জরিত হয়। তাই ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করে — 'যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যানি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্' (গর্ভোপনিষদ্)। ব্যাকুল হইয়া তিনবার প্রার্থনা করে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার প্রভাবে সব ভুলিয়া যায়। সেজন্য এই বেদের বিধানে মানুষ অন্ততঃ দিনে তিনবার ভগবানকে স্মরণ করিবে এবং প্রার্থনা করিবে যাহাতে মহামায়া ভুলাইয়া না দেন।

গায়ত্রী নির্ঘোষ করিতেছেন, "তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহী।" বিশেষ করিয়া এই কলিকালে সব ভুলাইয়া দেন মহামায়া। তাই নিত্য সাধুসঙ্গের দরকার। সাধুসঙ্গ ছাড়া এই সময় ধর্মলাভ হয় না। গৃহস্থাশ্রমে যাহারা থাকে তাহাদের আরও বেশী দরকার — নিত্য সাধুসঙ্গ, নিত্য প্রার্থনা, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা।

আমাদের এই পৃথিবীতে জন্ম যেন প্রবাস। এখানে কর্ম করিতে আসা। কর্ম ফুরাইলেই 'নিজ নিকেতনে' চলিয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ ভগবানের কাছে। সংসারে থাকিতে হয় বড়ঘরের দাসীর মত। দাসী সারাদিন মনিবের ঘরে কাজ করে। কিন্তু, মন থাকে নিজের গ্রামে,

যেখানে তাহার পুত্র কন্যা আছে। কচছপের মত থাকিতে হয় সংসারে। কচছপ থাকে জলে, কিন্তু ডিম পাড়ে আড়ায়। যেখানে নিজ জন, সেখানেই মন।

পরিজনের সকলকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করিতে হয়। তাহাদিগকে ভালবাসা দেখাইতে হয় — কিন্তু, মনে করিতে হয়, ইহারা আমার কেহ নয়, আমিও ইহাদের কেহ নহি। ঈশ্বরই সকলের আপনার।

শ্রীমতী গুপ্তা এইসকল কথা অতি ব্যাকুলভাবে শুনিতেছিলেন আর সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন। ভরসার নূতন আলোক হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তিনি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল কথা আপনি কোথায় পাইলেন? সাধু বলিলেন, এই সব কথার উৎস যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আমি এই সব কথা শুনিয়াছি তাঁহার অতি বিশিষ্ট গৃহস্থ-সন্ন্যাসী ও অন্তরঙ্গ ভক্ত, মনীষী মহর্ষি শ্রীম-র নিকট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন সংসারতপ্ত জীবের শান্তিসুখের জন্য। শ্রীম বহুবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেও জগদম্বা ব্রহ্মশক্তির আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবশিবের সেবার জন্য তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ সন্ন্যাস। তাঁহার কৃপায় কয়েকশত যুবক সর্বত্যাগরূপ সন্ন্যাস লইতে সমর্থ হইয়াছিল। আর সহস্র গৃহস্থাশ্রমী গৃহস্থ-সন্ন্যাসের ছবি তাঁহার জীবনে প্রতিফিলিত দেখিত। সংসারের সব কাজ তিনি করিতেছেন, অথচ মনটি সদা ব্রহ্মলীন। ইহা দেখিয়া তাহারা উদ্দীপিত হইত।

## ৪

শ্রীমতী গুপ্তা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি লিপিবদ্ধ আছে? সাধু বলিলেন হাঁ। ‘শ্রীম-দর্শন’ নামে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আমার সঙ্গে আছে। তাঁহার ঐকান্তিক ইচছায় সাধু বাংলা পাণ্ডুলিপি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। এই অর্ধমৃতাবস্থায় নূতন এক উন্নততর আনন্দময় সুখময় জীবনপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। সাধুর কাছে অনুরোধ করিলেন, এই পাণ্ডুলিপি আমায় দিন। আমি ইহা প্রকাশ করিব।

বারংবার অনুরোধে সাধু সম্মত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি রচিত বাংলায়। শ্রীমতী গুপ্তা সঙ্কল্প করিলেন, বাংলা শিখিবেন। সাধু তাঁহার ইচছা জানিয়া কলিকাতা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত দুই ভাগ 'বর্ণপরিচয়' আনাইয়া দিলেন। আর ইনিও পিতার নিকট হইতে বাংলা ইংলিশ টিচার চাহিয়া লইলেন। সাধু চলিয়া গেলেন।

এই রোগশয্যায় থাকিয়া দুই মাসের মধ্যেই তিনি নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখিয়া লইলেন। আর প্রথম ভাগ 'শ্রীম-দর্শন'-এর হিন্দী অনুবাদ শুইয়া শুইয়াই আরম্ভ করিলেন। অন্যদিকে বাংলা শ্রীম-দর্শনের প্রকাশের ভার লইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমি যেমন ব্যাকুল হইয়া এই ভার লইবার মতো লোকের অন্বেষণ করিতেছিলাম কিন্তু কেহই ভার লইলেন না — তেমনি তিনি এই ভার তাঁহাকে দিবার জন্য বারম্বার ব্যাকুল চিত্তে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সেই প্রারম্ভের পরিণতি শ্রীম-দর্শনের পঞ্চদশ খণ্ডের প্রকাশ।

শ্রীমতী গুপ্তার অনূদিত প্রথম দুই খণ্ড হিন্দী 'শ্রীম-দর্শন' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। শ্রীমতী গুপ্তার হিন্দী অনুবাদ হইতে তাঁহার স্বামী প্রিন্সিপ্যাল ধর্মপাল গুপ্তা দুই খণ্ড 'শ্রীম-দর্শন' ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, 'M. the Apostle and the Evangelist' নামে। কিন্তু সব পুস্তকেরই প্রকাশিকা শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা। তাঁহার এই মহাকার্য দেখিয়া সত্যই মনে হইতেছে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের কাজ নিজেই করাইয়া লন ভক্তগণের দ্বারা, হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া। কি আশ্চর্য! রোগাক্রান্তা, অর্ধজীবিতা, অবাঙ্গালী পাঞ্জাবের অধিবাসিনীকে যন্ত্র করিয়া প্রভু কি অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন! কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণে অসংখ্য সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি।

ঠাকুরের এই সেবা যেন শ্রীমতী গুপ্তার জীবনের আর মনের মহৌষধ। বিগত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের এই সেবারূপী মহৌষধে তিনি জ্ঞানভক্তিতে উজ্জীবিতা। ইতিহাস আর হিন্দীতে তাঁহার যুগল এম.এ. পড়া সার্থক!

শ্রীমতী গুপ্তার নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। মর্মে মর্মে বুঝিতেছি, ভগবানের কৃপা কেবল 'মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্'

নহে। পরন্তু, মৃতকে সঞ্জীবিত করে, নগন্য তৃণকে আচার্যের রূপ প্রদান করে। সেই কৃপাতেই অলেখক সুলেখক হয়।

মহাগ্রন্থ রচনায় আর প্রকাশনে যে সকল ভক্ত বন্ধুগণ যে কোন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই লেখকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত হইতেছে।

উপসংহারে প্রিন্সিপাল ধর্মপাল গুপ্তাকেও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিগত দ্বাদশ বর্ষ তাঁহাদের আবাসস্থল আমার বাসস্থান এবং সেবাকেন্দ্র। তাঁহার মহানুভবতার জন্য আমি ঋণী।

আর একজন ভক্ত বন্ধুর কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস। বাংলা শ্রীম-দর্শনের প্রুফ দেখা হইতে গ্রন্থের অঙ্গরাগাদি যাবতীয় কর্ম করিবার জন্য আমি তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ। তাঁহার ভিতরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া রোগক্লিষ্ট ভগ্নস্বাস্থ্যেও এইসকল কার্য করাইয়া লইতেছেন।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে করি। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে হঠাৎ আমি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হই হোসিয়ারপুরে। সমগ্র মুখের ভিতর — গলা পর্যন্ত, বড় বড় ফোড়া হইতে রক্ত নির্গত হইতেছিল। শরীরের তাপমাত্রা ১০৫°। শিরে নিদারুণ বেদনা। সমগ্র শরীরে যেন অগ্নি জ্বলিতেছিল। বাহ্যচেতনা কখনও একেবারে লুপ্ত, কখনও বা প্রায়-বিলুপ্ত। বিকারগ্রস্ত, মুখে জলবিন্দুও প্রবেশ করে না। জোর করিয়া দিলে মৃত্যুযন্ত্রণা। ডাক্তার ভীত হইলেন।

রাত্রিতে একা। হতচেতন অবস্থা। এক দৈবী স্বপ্ন দেখিলাম, শ্রীশ্রীমা (Holy Mother) তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার ছবি নিয়া আমার বিছানার নিকটে পাকা মেঝের উপর দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরমুখী। পরনে লাল নরুনপেড়ে ধুতি। মাথায় তাঁহার স্বাভাবিক ঘোমটা। তাঁহার বামদিকে আরও তিনজন সঙ্গিনী ভক্ত মহিলা। আমার শিয়র পূর্বদিকে। শিয়রের উপরের দরজা ছিটকিনীতে আবদ্ধ। স্বপ্নেই মাকে দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম — মা,

তুমি কি করে ঘরে ঢুকলে? আমি যে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। তিনি মৃদু হাস্যে ইঙ্গিতে বলিলেন, (এক) খুব ভুগবে। (দুই) সব ব্যবস্থা হবে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। স্মৃতিতে রহিল কেবল মায়ের ছবি আর চতুর্থ ভক্ত মহিলা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি আজ পর্যন্ত স্মৃতিপথে আনিতে পারি নাই। ঐ অবচেতন অবস্থায়ই মনের ভিতর বিচার চলিতেছে — এ কি দৃশ্য? এ কি কেবলমাত্র স্বপ্ন? না, ইহা সত্য? স্বপ্ন তো স্বপ্নই বটে — সে তো মিথ্যা!

রাত্রি প্রভাত হইলে ডাক্তার আসিলেন সকাল বেলায়। পরীক্ষা করিয়া চিন্তিত হইলেন। অনুমান করিলেন, দাঁতের ইনফেকশন! আরও কয়েকজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইলেন — দন্ত চিকিৎসকেরও। পরামর্শে নিশ্চিত হইলেন, শরীররক্ষা অসম্ভব। চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন, এই অবস্থার একমাত্র ঔষধ নব আবিষ্কৃত মাইসিনের প্রয়োগ। ইনজেকশন চলিতে লাগিল।

অপরাহ্ন চারিটায় ডাক্তার পরীক্ষা করিতেছেন। আমার অল্পমাত্র জ্ঞান আছে। চক্ষু মুদ্রিত। শরীর ও মস্তকে দারুণ জ্বালা। ঐ সময়ে একটি হাত আমার কপালে স্থাপিত হইল। শান্তি অনুভব করিলাম। অল্পমাত্র চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম অস্পষ্ট ভাবে, ইহা শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তার হস্ত। ঐ যন্ত্রণার ভিতর বিস্মিত হইলাম আমি — এ কি ঘটিল! ইনি যে মায়ের সহচারিণী স্বপ্নদৃষ্টা চতুর্থ ভক্ত মহিলা! শ্রীমতী গুপ্তা আমার অবস্থা দেখিয়া ঐ ঘরেই অপর একটি বিছানায় আসন করিলেন। তিনিও সম্যক্ সুস্থ নহেন। বাইশ দিন সেখানে, সেই ঘরেই অবস্থান করিলেন। অন্য কোথাও না গিয়া আমার সেবায় নিযুক্তা। আহা, কি সেবা! যেন মায়েরই আর একটি রূপ। বাঁচিবার সম্ভাবনা আমার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শ্রীমতী গুপ্তা ডাক্তারকে বলিলেন, পেটে কিছু দিন, কেবল ঔষধে শরীর থাকিবে না। এদিকে কণ্ঠে জলবিন্দু প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ করি। পুনরায় ডাক্তারকে বলিলেন, আপনার হাসপাতালে যেসব এনেস্থেসিয়া আছে সেগুলি আমায় দিন।

তৎক্ষণাৎ উহা আসিল। আমার চিৎকারে কর্ণপাত না করিয়া আঙ্গুলে তুলা জড়াইয়া আমার জিহ্বার উপর তিনবার তিন রকমের এনেস্থেসিয়া

প্রয়োগ করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদ্র একটি বাটিতে প্রচুর ঘৃতাক্ত খিচুড়ী চামচ দিয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন। আমার চিৎকারে তিনি বধির। ডাক্তার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্ত ও বন্ধুদের মধ্যেও কেহ কেহ উপস্থিত।

দুই একদিন পরে আবার শরীরের যায় যায় অবস্থা। সেদিনও ডাক্তার ও ভক্তগণ কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শরীর আর থাকে না। পেট ময়লায় পরিপূর্ণ, দম প্রায় বন্ধ। যন্ত্রণায় চিৎকার করিতেছিলাম। শ্রীমতী গুপ্তা ডাক্তারকে বলিলেন, ডুস্ দিয়া পেট সাফ করুন। ডাক্তার তাহা করিতে রাজী নন্। কারণ, মাইসিনের রোগীর পেট খারাপ হইলে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তা বলিতেছেন, শরীর তো যাবার মুখে — আপনি ডুস্ দিন। শরীর যায়, যাবে।

ডুস্ দেওয়া হইল, প্রথমে কাজ হইল না। তিনি বলিলেন, ক্যাথিডার দিন। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সপ্তাহের জমা ময়লা বাহির হইয়া গেল, আমিও তৎক্ষণাৎ সুস্থ বোধ করিলাম। পেটও খারাপ হইল না। বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তা অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। এইরূপে আরও দুইবার অমৃতসরে ও সোলনে দুষ্ট রোগবৃদ্ধিতে তিনি দূরবর্তী স্থান হইতে (রোহতক ও চণ্ডীগড়) দৈবী প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া আমার শয্যাপাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ সবই মায়ের কৃপা। বুঝিলাম, মা আমার শরীররক্ষার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি মায়ের যন্ত্র। আমি আরও বুঝিলাম যে, আমার কাজের জন্য ঠাকুর শ্রীমতী গুপ্তাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আর মা তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন আমার শরীর রক্ষার জন্য। মনে জাগ্রত হইল পূজ্যপাদ শ্রীম-র শেষ প্রবোধ — 'বাপমাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে নিশ্চিন্তে। কি ভাবনা?' আর শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অভয় বাণী — 'বিশ্বাস করিও, ঠাকুর সর্বদা আপন ভক্তের সঙ্গে থাকেন।' দৈবী কৃপার খেলা বিচিত্র!

শ্রীম দর্শনের পঞ্চদশ ভাগ শ্রীম-র জীবনের বিস্ময়কর বাণী ও তাঁহার অতিমানবীয় আচরণের কথা বহন করে। আর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মশক্তি মা সারদা (Holy Mother), স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের এবং গৃহস্থ সন্ন্যাসীগণের জীবন-কথাও বহন করে। আর

বহন করে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-কথামৃতের সরস সুললিত ও সুগভীর ভাষ্য, ‘কথামৃতে’র লেখকের দ্বারা। উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র, এবং বাইবেল কোরাণাদি নবীন ধর্ম্মমতের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উদার সজীব ও রসময় ভাবসম্মত মনোহর ব্যাখ্যাও ইহা বহন করে। অধিকন্তু, ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহান ও সুযোগ্য দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ব্রহ্মলীন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দিব্য ও অমূল্য বাণী ও জীবনবেদও হৃদয়ে ধারণ করে এই পঞ্চদশ খণ্ড।

এই পঞ্চদশ খণ্ডের ‘প্রেস কপি’ তৈরী হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট (শ্রীম ট্রাস্ট) ৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় (579, Sector 18-B, Chandigarh) কার্য্যালয়ে।

শ্রীম-দর্শনের পঞ্চদশ কুসুমে গ্রথিত এই মহাগ্রন্থমালা পাঠ করিয়া পাঠকগণ পরমানন্দ, শান্তি ও মহাসুখ লাভ করুন — গ্রন্থকারের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশনে যে যে-কোন ভাবে সহায়তা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। অবশেষে একটি সূচনা নিবেদন করিতেছি। শ্রীম ও শ্রীমহাপুরুষের কথার পাণ্ডুলিপির কতকাংশ অপ্রকাশিত রহিয়া গেল স্থানাভাবে। ভবিষ্যতে ঐ সব কথা পূর্বপ্রকাশিত চতুর্দশ খণ্ডের সঙ্গে সংযোজনা করিয়া দিবার ইচছা রহিল। আর একটি বাসনাও অপূর্ণ রহিয়া গেল। সেইটি এই — ‘শ্রীম-দর্শন’ পঞ্চদশ খণ্ড ও ‘কথামৃত’ পাঁচ খণ্ড অবলম্বনে শ্রীম-র জীবনচরিত রচনা। উহা ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ।

বিনীত

**গ্রন্থকার**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসী মঠ)।
৩৮, হরিদ্বার রোড, ঋষিকেশ, হিমালয়।
দেবীপক্ষ, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।